সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • জানুয়ারি ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার মেলবন্ধন হোক

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন

শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর কৌশল

গল্প : ছাতিম গাছ

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী দাসীর কবিতা

একজন বিদ্যানুরাগী

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর এলাকায় লোকগান

শিক্ষালোক
সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

জানুয়ারি ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের একদিন আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় শিশুশিক্ষার্থীরা নাচ-গান-আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ করে থাকে। এতে অভিভাবক ও এলাকার শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন ও তা উপভোগ করেন। এ কারণে পুরো সপ্তাহ জুড়ে আমাদের কর্ম-এলাকাগুলোয় একধরনের উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। আমরা মনে করি শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। শিশুশিক্ষার জন্য তা আরো বেশি জরুরি। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এবছর আমাদের শিশুশিক্ষার্থীদের ঘিরে আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানসংক্রান্ত লেখা দিয়ে এবারকার শিক্ষালোক-এর বেশিরভাগ সাজানো হলো।

২০১৪ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা শিক্ষালোক-এর ৬টি সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। এই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বর সংখ্যাটি বাদ যাওয়ায় একটি ছেদ পড়েছে বলা যায়। কিন্তু তা আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতায় ঘাটতির জন্য নয়। আশা করছি, ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা নিয়ে প্রকাশিত আমাদের এ বুলেটিনে আমাদের ভালবাসার ছাপ আগের মতোই পাওয়া যাবে। শিক্ষালোক পেয়ে যাঁরা এর প্রশংসা করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

সকলের সহযোগিতা-সমর্থনকে পাথেয় করে আমরা নতুন বছর আরো এগিয়ে যেতে চাই।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন কমিউনিকেশনস্ লি.
ফোন : ৯১০৪৬৩৭
ই-মেইল : office@masslinebd.com

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার মেলবন্ধন হোক

আলমগীর খান

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান ও গড় আয়ু বেড়েছে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে. শিক্ষার হার বেড়েছে ইত্যাদি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থা নিম্নগামী হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচে বেশি চোখে পড়ে সংস্কৃতি। আমাদের লোকসংস্কৃতি আজ মুমূর্ষু। আমাদের নিজস্ব নাট্যরূপ যাত্রা আজ প্রয়োজনীয় প্রণোদনা পাচ্ছে না।

হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির নিজস্ব নাচ-গান। আমাদের চলচ্চিত্র রোগাক্রান্ত। সিনেমা হল ভেঙ্গে গড়ে উঠছে শপিং মল আর বইয়ের বাজার ভেঙে কাপড়ের দোকান। নাটক হয়ে পড়েছে প্রধানত শহুরে ব্যাপার এবং ক্রমান্বয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক। গ্রামীণ অনুষ্ঠানে একসময় যেসব গান-বাজনা হতো, এখন তা আর শোনা যায় না। এখন বিয়ে, মুসলমানি, পূজাপার্বণ প্রায় সব অনুষ্ঠানেই সিনেমার নাচ-গানের সমাহার, যা আবার দেশি-বিদেশি যেকোনো কিছু হতে পারে। দেশে বাড়ছে দালান-কোঠা। তাল মিলিয়ে বাড়ছে কংক্রিটের হৃদয়। তাই এখন 'একতারা বাজাইয়ো না, দোতারা বাজাইয়ো না, ... একতারা বাজাইলে মনে পড়ে যায়, মোরা একদিন বাঙালি ছিলাম রে।'

সংস্কৃতির প্রাণরস নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের সমাজদেহে নানারকম বিকার দেখা দিচ্ছে। বছর বছর পাশের হার ও শিক্ষার হার বাড়ছে। একইসাথে শোনা যায় নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা। বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জ্যাম ও সড়ক দুর্ঘটনা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মধ্যে দুর্নীতি-পরায়ণ লোকের জয়জয়কার। দুর্নীতির অট্টহাস্য আর সুনীতির কান্না দুইই সমান তালে বাড়ছে। চলছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ আর নীতিকথার যেমন-খুশি-তেমন-সাজো। দুর্নীতিবাজ ও নীতিবাজ দুপক্ষই কেউ বেশি কেউবা কম ফায়দা লুটে নেয়। আগে গল্প-সিনেমায় সৎমা নায়ক-নায়িকার খাবারে বিষ মিশিয়ে তাকে মারার চেষ্টা করতো। বাস্তবে সকল সৎমা খারাপ না, অনেকে মায়ের মতোই আপন। তবে এখন সৎমা নয়, অসৎ ব্যবসায়ীরা, নায়ক-নায়িকা নয়, দেশের সকল মানুষের খাবারে বিষ মিশিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে। ডায়রিয়ায় এখন আগের মতো মানুষ মারা যায় না, বসন্ত নির্মূল প্রায়, যক্ষা হলে রক্ষা নাই মিথ্যা হয়ে গেছে। তাতে কি? ঘুষ, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং এসব মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ভাল কথার পুষ্পবৃষ্টি দিয়ে কি এ মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?

আমাদের নৈতিক শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। কিন্তু নৈতিকতা শুধু বই-পুস্তকের বিষয় না। এটি একটি চর্চার বিষয়। আর সে চর্চা শুধু ব্যক্তিক নয়, দলীয়, সামাজিক। খেলাধুলা, বইপড়া, সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে আবৃত্তি-নাচ-গানের মতো সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রকৃত নৈতিকতার শিক্ষা হয়। নৈতিকতা ক্যাপসুল বা সিরাপ আকারে দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। এটি বোতলজাত বিশুদ্ধ পানির চেয়েও বেশি কিছু। এটি মানুষের আক্সিজেন যা কেবল সংস্কৃতিচর্চার হাওয়া থেকেই পাওয়া যায়। আজকাল দেশে সেই হাওয়ারই বড় অভাব। যেটুকু হাওয়া এখনও মানুষের হৃদয়কে বাঁচিয়ে রেখেছে, তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত চেষ্টার ফল। আর কিছু চর্চা হয় চারকোণা বাক্সে, কিছু ব্যবসায়িক স্বার্থে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সামান্যই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার বাহন হিসেবে আমাদের লোক-সংস্কৃতি, যাত্রা প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাইবার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রকারে শিক্ষা দু-চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটে-খাটো খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম। নীতিবচনের বাঁধি বোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মরাল টেক্সটবুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনোই সংস্রব নাই।

'আমাদের নীতিজ্ঞরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়োই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও তো তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজ যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখে তো লোকে স্বভাবত সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্খা পূরণ হইবে না।'

আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত লক্ষ্য: 'দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।' সংরক্ষণে অবহেলার ক্ষেত্রে বাঙালির আকাশচুম্বী খ্যাতি রয়েছে। আর 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন'-এর কথা বলা হলেও বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক চর্চাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ও জোরদার করতে যে ভূমিকা রাখতে হবে তা পর্যাপ্ত নয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, ঢাকাকেন্দ্রিক, কখনো কখনো জেলাভিত্তিক যেসব অনুষ্ঠান করা হয়, তাতে ব্যাপক সাধারণ মানুষকে সাংস্কৃতিক চর্চার উৎসবে টেনে আনাতে আরো উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে সত্যিকার অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদায় বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ 'কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা' অধ্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে, 'একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে এবং তার চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা যায়। এ শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের একদিকে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করা যায়, অন্যদিকে এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ 'কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা' অধ্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে, 'একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। এ শিক্ষার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও হস্তশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য বা অঙ্গবিক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর

এ অধ্যায়ে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে যথার্থই বলা হয়েছে, 'বর্তমান বিশ্বে মাদক-এর ভয়াবহ বিস্তারের কারণে দেশে যুব সমাজের অবক্ষয় মারাত্মক আকার ধারন করেছে। এ অবক্ষয় রোধে সুষ্ঠু মনন চর্চার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখা।' শুধু মাদক-সেবন নয়, বিভিন্ন ধরনের মানসিক বিকৃতিতে আজ আমাদের যুবসমাজ আক্রান্ত। আবার শুধু যুবসমাজ কেন, নানারকমের অসুস্থ চর্চা আজ আমাদের তরুণ ও কিশোর থেকে শিশুদেরকে পর্যন্ত গ্রাস করছে। সাংস্কৃতিক চর্চা শিক্ষার একটি অনিবার্য অংশ। সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে আমরা এমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধ্যান করতে পারি যা প্রথাগত টেক্সট বই মুখস্থ করিয়ে কোনদিনই সম্ভব নয়। শিশুর ওপর বইয়ের বড়বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে পণ্ডিত বানানোর অশুভ চেষ্টার মধ্য দিয়ে মানসিক বিকৃতিকে কেবল প্রশস্তই করা সম্ভব। যা দরকার তা হলো শিশুর সুকুমারবৃত্তিসমূহের বিকাশ – তাকে মিথ্যুক, অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বার্থপর ও চতুর বানানো নয়, দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে যা করে আসছে।

কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ৭ নং কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে, 'সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শহর ও গ্রাম পর্যায়ে চিত্রকলা ও কারুশিল্পের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে।' এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কবে যে এসব শুরু করা যাবে, তা বলা কঠিন। তবে আমাদের দেশে কাজটি মোটেও কঠিন নয়। কারণ বাঙালি ও এদেশের পাহাড় ও সমতলের অবাঙালি সবাই সংস্কৃতিবান জাতি। বাংলাদেশের প্রায়

সব অঞ্চলেই দুয়েকটা গান, নাটক, যাত্রা বা সার্কাসের দল রয়েছে। তাদেরকে সামান্য পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সরকার কাজটি অতি সহজেই করতে পারে। এর ফলে প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠবে এলাকার নিজস্ব, মানুষের প্রাণের অনুষ্ঠান। তাতে মানুষের অংশগ্রহণ হবে স্বতঃস্ফূর্ত। এর ফলে বিভিন্ন এলাকার যে বিশেষ সাংস্কৃতিক দক্ষতা ও বিশেষত্ব তারও স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটবে। সাধারণ মানুষও এসব অনুষ্ঠান সফল করতে আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও কায়িক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী', 'ক্রীড়াশিক্ষা' ও 'গ্রন্থাগার' শীর্ষক অধ্যায়গুলোর (১৮, ১৯ ও ২০ অধ্যায়) উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এসবের ইতিবাচক ফল শুধুমাত্র সংস্কৃতিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে তা বিরাট পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে উঠবে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী', 'ক্রীড়াশিক্ষা' ও 'গ্রন্থাগার' শীর্ষক অধ্যায়গুলোর (১৮, ১৯ ও ২০ অধ্যায়) উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশল-সমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এসবের ইতিবাচক ফল শুধুমাত্র সংস্কৃতিক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে তা বিরাট পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে উঠবে।

জাতীয় জীবনে সংস্কৃতিচর্চার নদনদীকে শুকিয়ে ফেলে ও দূষিত করে দিয়ে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার খাল কেটে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিলে তা আত্মঘাতী হয়। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা -তিতাস-সুরমা-বুড়িগঙ্গার আজ করুণ দশা। আমাদের ভূগর্ভস্থ পানিও আর্সেনিক-আক্রান্ত। এখন আধালিটার খাওয়ার পানি বাজারে পনের টাকায় বিক্রি হয়। পদ্মার ইলিশ এখনই আকাশের চাঁদ, এরপর একদিন আকাশকুসুম হয়ে উঠলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তখন হয়তো পদ্মার ইলিশ বাঙালিকে বিদেশ থেকে আমদানি করে চেখে দেখতে হবে। এখনই একতারা শুনলে আমাদের মনে পড়ে যে, কোন একদিন আমরা বাঙালি ছিলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক শুষ্কায়ন যদি চলমান থাকে, তবে একদিন একতারা শুনেও তা মনে পড়বে কিনা বলা যায় না। 'তিতাস একটি নদীর নাম'ই শুধু নয়, এক বিরাট জীবন-প্রবাহ যার ছবি এঁকেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। নদীতে মাছ থাকে। মানুষ ডাঙায় থাকে। তবে নদীর কোলেই মানুষের সভ্যতা গড়ে ওঠে। আর মানুষ বাস করে সংস্কৃতির নদীতে। সংস্কৃতির জলেই মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও বেড়ে ওঠা। সেই সংস্কৃতির নদনদীতে চর পড়লে বা তার জল দূষিত হয়ে পড়লে জলের মাছ ডাঙায় তুললে যা হয়, তাই হয় জাতির জীবনে। আমাদের সংস্কৃতির নদনদীকে গভীর, প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলা আজ তাই অতি জরুরি। সাংস্কৃতিক চর্চাবিহীন শিক্ষা জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের গল্পের তোতাপাখির মর্মান্তিক পরিহাস মাত্র। দেশের আনাচেকানাচে আমাদের একটি সাংস্কৃতিক ঝড় প্রয়োজন। স্কুল থেকেই শুরু হোক না কেন। যদি শিশুরা করে, তবে তা খুবই সহজ ও একশ ভাগ সম্ভব।

ভোরের কাগজ পত্রিকায় ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত। ডেইলি অবজার্ভার পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ইংরেজিতে প্রকাশিত। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে এখানে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হলো।

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চর্চায় সিদীপের উদ্যোগ

দরিদ্র পরিবারের শিশু যারা বাড়িতে মা-বাবা-ভাই-বোনের সহায়তা নিয়ে স্কুলের পড়া তৈরি করতে পারে না তাদেরকে সিদীপ শিক্ষা-সহায়তা দিয়ে থাকে। সিদীপ-এর একেকটি শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রামের কোনো শিক্ষিত মেয়ে ২০-২৫ জন দরিদ্র পরিবারের প্রাক-প্রাথমিক, ১ম ও ২য় শ্রেণির ছেলেমেয়েকে আগামী দিনের ক্লাসের পড়া শিখিয়ে দেয়। সারাদেশে ১৩টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় আড়াই হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে এ সহায়তা পায়। ২০১৩ সাল থেকে এসব শিক্ষাকেন্দ্রে বছরের শেষদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, পায়খানার পর ও খাবার আগে দুইহাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধোয়া ইত্যাদি চর্চা করতে শিক্ষিকা তাদেরকে উৎসাহিত করেন। এরপর নভেম্বর মাসের শেষে একটি সাংস্কৃতিক সপ্তাহ আয়োজন করা হয়। একেক স্কুল একেকদিন এ আয়োজন করে। অনেকক্ষেত্রে একাধিক স্কুল মিলেও অনুষ্ঠান হয়। সিদীপের একেকটি কর্ম-এলাকায় এভাবে পুরো সপ্তাহ জুড়ে একটি অনুষ্ঠানমালা চলতে থাকে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অনেক এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সারাদেশে সিদীপের কর্ম-এলাকাগুলোয় একটি উৎসবের আমেজ তৈরি হয়।

এবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ: বলতে গেলে প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা জাতীয় সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাচ ইত্যাদি পরিবেশন করে। এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি প্রমুখ অতিথি হিসেবে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। তারা অনেকেই অনুষ্ঠানের নানারকম খরচ স্বেচ্ছায় নিজেরা বহন করছেন। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবক এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানস্থল কেউ কেউ চাঁদোয়া দিয়ে, কেউ কেউ চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজিয়েছিলেন। অনেকেই মাইক ভাড়া করেছিলেন। প্রায় সবাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে তাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে ঘোষণা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হয়। অনেকেই সকল শিক্ষার্থীর জন্য চকলেট, কলম বা অনুরূপ কোনো সান্ত্বনা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতিটি ছেলেমেয়েই সুন্দর পোষাক পরে অনুষ্ঠানে এসেছিল। যেসব শিশু কবিতা, গান, নাচ ইত্যাদি পরিবেশন করেছে, তাদেরকে সিদীপ-শিক্ষিকারা অনুষ্ঠানের উপযোগী সুন্দর পোশাক, ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছিলেন। বিভিন্ন বয়সের স্থানীয় নারী-পুরুষ সেসব অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় করেছেন। বাচ্চাদের পরিবেশন তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করেছেন। বেশিরভাগ অনুষ্ঠান দুপুর ২/৩টায় শুরু হয়েছে আর শেষ হয়েছে সন্ধ্যার পর। প্রতিটি অনুষ্ঠানে ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবমুখর পরিবেশ।

প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের মনকাড়া অনুষ্ঠান

চর্মরোগের শিকার হাসানের নৃত্যে অংশগ্রহণ: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কসবা উপজেলার অন্তর্গত খিদিরপুর গ্রামে আলী আহমদের বাড়িতে ৩টি স্কুল মিলে একটি অনুষ্ঠান হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একজন অভিভাবক মো. শাহজাহান, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. আব্দুল মতিন ও একজন স্বাস্থ্য সহকারী মো. মনির হোসেন। চারদিকে প্রায় সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল ৩টির শিক্ষিকা রুনা আক্তার, মাকসুদা ও নীপা। রুনা ও মাকসুদা উচ্চমাধ্যমিক ১ম বর্ষে পড়ে আর নীপা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১ম বর্ষে পড়ে। তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে সিদীপ সদস্যের ছেলেমেয়ে অর্ধেকের বেশি তারা জানান। তারা বলেন যেসব প্রাথমিক স্কুলে এ বাচ্চারা পড়ে তাদের শিক্ষকেরা সিদীপ শিক্ষিকাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন, যেহেতু শিক্ষাকেন্দ্রে পড়া শিখিয়ে দেওয়ায় বাচ্চাদের অনেক উপকার হয়। ৩ জন শিক্ষিকাই ভবিষ্যতে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান।

মাকসুদার কাছে হাসান নামের একটি দরিদ্র ছেলে পড়ে। সে কঠিন চর্মরোগের শিকার। দেখলে মনে হয় শিশুটির মুখের একাংশ পুড়ে গেছে। তার বয়স প্রায় ৭ বছর হলেও তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। কেননা ক্লাসে অন্য বাচ্চারা তাকে দেখে ভয় পাবে বলে অনেকের ধারণা। মাকসুদার কাছে সে বিনা বেতনে পড়ছে। সে একটি দলীয় নাচে অংশ গ্রহণ করে। হাসানকে মাকসুদা স্কুলে ভর্তি করতে চেষ্টা করবেন বলে জানান।

গ্রামে শিক্ষার আলো সম্প্রসারণে আঁখির সাধনা: কুমিল্লায় মুরাদনগর উপজেলার অন্তর্গত বৈলাবাড়ি গ্রামে শামছু মিয়ার বাড়িতে ১টি স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে আক্তার হোসেন, আলী আকবর ও ওয়ার্ড সদস্য মদন মিয়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ অধীর আগ্রহে উঠানের চারপাশে বসেছিলেন। তাঁরা তাঁদের শিশুদের আবৃত্তি, নাচ, গান ইত্যাদি আন্তরিকভাবে উপভোগ করেন।

আঁখি আক্তার এ স্কুলের শিক্ষিকা। এতে ২৭ জন ছেলেমেয়ে শিশু, ১ম ও ২য় শ্রেণিতে পড়ে। এ শিশুরা বেশিরভাগই সিদীপ সদস্যদের সন্তান ও প্রায় সবাই দরিদ্র। এদের মধ্যে ৫/৬ জন শিক্ষিকাকে মাসিক ৪০/৫০ টাকা বেতন দিতে পারে না। আঁখি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষের ছাত্রী। চার বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। দু বছর তিনি পড়ালেখা করতে পারেননি। তার একটি মেয়ে আছে। এখন নূতন করে পড়ালেখা করতে তার নিজ ও শ্বশুর বাড়ির সবাই তাকে উৎসাহ দিচ্ছে ও সহযোগিতা করছে। ভবিষ্যতে তিনি একজন শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

পড়ালেখা, সংসার চালানো ছাড়াও আবার এ সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্র চালানোর কারণ সম্পর্কে আঁখি জানান, 'আমি এ গ্রামের মেয়ে। আমি চাই আমার গ্রামে শিক্ষার আলো সম্প্রসারিত হোক।'

প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বর্ণালীর স্কুল: ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবীনগর উপজেলার অন্তর্গত ভোলাচং দাসপাড়ায় জেলে, কুলি ও জুতাশ্রমিক ঋষি পরিবারের বাস। নবীনগর সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ১ম বর্ষের ছাত্রী স্বর্ণালী দাস এখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে ২০ জন শিশুকে পড়ান। তারা ভোলাচং উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আরো ৩টি শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে একত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রান্তিক পরিবারের এসব শিশুর আবৃত্তি, গান, নাচ উপস্থিত প্রায় ৫০০ দর্শককে অনাবিল আনন্দ দেয়।

স্বর্ণালীর বাবাও জেলে। দরিদ্র হলেও তার বাবামা ছেলেমেয়ের পড়ালেখার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। সে কারণে স্বর্ণালীর ভাইবোন সবাই পড়ালেখা করছে। তার বড় বোন ১০ বছর ব্র্যাক স্কুলে পড়িয়েছেন। স্বর্ণালী জানান, পাড়ার দরিদ্র বাবামা তাদের ছেলেমেয়েকে তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। স্বর্ণালীর কাছে পড়ার জন্য তারা সবাই খুশি। অভিভাবকগণ মনে করেন যে, এতে তাদের বাচ্চাদের অনেক উপকার হচ্ছে।

স্বর্ণালীকে প্রত্যেক শিশু ৫০ টাকা করে দেয়। তবে ১ম শ্রেণির ২ জন মেয়ে কোন টাকা দিতে পারে না। এদের একজনের বাবা নেই ও অন্যজনের বাবা কুলির কাজ করেন। স্বর্ণালী সকালে প্রাইভেটও পড়ান। তিনি বলেন, সিদীপ যে সম্মানী দেয় তা সামান্য। কিন্তু সিদীপ সম্মানী আরো কমিয়ে দিলে বা আদৌ না দিলে তিনি কি করবেন বা শিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিবেন কিনা – এ প্রশ্নের জবাবে স্বর্ণালী হেসে জানান, না, তিনি স্কুলটি তবু চালাবেন। কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এরা তো আমার পাড়ারই ছেলেমেয়ে। তারা শিক্ষার আলো পাবে, তাই স্কুলটি চালাবো।'

সাংস্কৃতিক উৎসবের পলি দিয়ে গ্রামীণ মানসজীবনের সমৃদ্ধি : সম্ভাবনা ও সতর্কতার উপাদান

সারাদেশে সিদীপের কর্ম-এলাকাসমূহে প্রতি বছর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঢেউ ওঠে। যে গ্রামবাংলা ছিল একসময় ছড়া-গান-পাঁচালি-পুঁথি-কবিগান-যাত্রা ইত্যাদির কলকাকলিতে ভরপুর তা আজ নিশ্চুপ-নিষ্প্রাণ প্রায়। এখন আর সুর নয়, দলাদলি আর পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেসুরে তা ভরে উঠেছে। এর মধ্যে ডিশ চ্যানেলের ম্যানুফ্যাকচারড সংস্কৃতি উপভোগ মরুভূমিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত দিয়ে শস্য ফলানোর মতো। এ প্রেক্ষাপটে সিদীপের এ সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন শুকিয়ে যাওয়া গ্রামাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূমিতে একটি ক্ষুদে ঝর্ণাধারার মতো। এর সঙ্গে আরো অনেক ঝর্ণাধারা যোগ হলে একদিন একটি নব সাংস্কৃতিক প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে। আবার এ সম্ভাবনার স্বপ্ন স্বপ্নেই হারিয়ে যেতে পারে।

তদুপরি, এ সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে সুন্দর স্বপ্নটি যে দুঃস্বপ্নেও পরিণত হবে না তা হলফ করে বলা যায় না। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, প্রতি বছর একটু একটু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জৌলুস বাড়ছে, সেইসাথে তা হয়ে উঠছে ব্যয়বহুল। এ জৌলুস ও ব্যয় বৃদ্ধির সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে।

দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থা থেকে কোনো সাধারণ দিকনির্দেশনা না থাকলে এতে কোথাও কোথাও কিছু নেতিবাচক উপকরণের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে যা উপযুক্ত পদক্ষেপের অভাবে ভবিষ্যতে আরো বাড়তে পারে। এগুলো হলো কোনো কোনো অনুষ্ঠানে হিন্দি ছবির নাচ-গানের বাহুল্য ও আধিপত্য যা সাধারণত এলাকার তরুণ-তরুণীদের প্রধান আকর্ষণ। সেক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উৎসবের পলি দিয়ে গ্রামীণ মানসজীবনকে সমৃদ্ধ করার এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগটি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, শিশুর মনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতার অসুস্থ মানসিকতা তৈরি হতে পারে। আর যারা পুরস্কার পাচ্ছে না তাদের মনে হতাশা, হীনমন্যতা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থত, যে দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি, সেখানে তাদেরকে পিছনে ঠেলে দিয়ে স্বচ্ছল ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের প্রভাব বৃদ্ধি ও সাফল্যের জয়মাল্য জেতার সম্ভাবনা। কেননা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরাই এসব প্রতিযোগিতায় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ও বেশি পুরস্কার জিতে নিবে।

তবে যেকোন বিরাট উদ্যোগেই কিছু ঝুঁকি বিদ্যমান। এসকল ঝুঁকি মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হয়। তাই সঠিক চিন্তাভাবনা করে সকলে মিলে কাজ করলে এ থেকে বিরাট সুফল পাওয়া যাবে।

আনন্দ কেন স্কুলের বাইরে আর স্কুল নিরানন্দ?

শিশুরা তোতাপাখি নয় যে তাদেরকে শুধু বই-পুস্তক গেলাতে হবে। শিশুকে শিশুর মতোই বড় হতে দেওয়া প্রয়োজন। সে চায় খেলাধুলা, ছড়া বলা, নাচ, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনন্দ। সবসময় নতুন কিছু জানতে ও শিখতে চাওয়া তার সহজাত প্রবৃত্তি। আনন্দময় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই শিশুর এই মানসিক চাহিদা সবচেয়ে বেশি পূর্ণ হয়। বড়দের কর্তব্য শিশুর এই সহজাত চাহিদাকে তার উপযোগী করে পূর্ণ করতে সহায়তা করা। সে কারণে খেলাধুলা, গল্প বলা, ছড়া বলা, নাচ, গান, অঙ্কন, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি শিশুশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হতে হবে। শিশুশিক্ষার সঙ্গে জড়িত অধিকাংশই এটা মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু কাজে তেমন পালন করেন না। আমাদের শিক্ষানীতিতেও এব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের শিশুদের শিক্ষাজীবনে সাংস্কৃতিক চর্চার অবস্থান সামান্য। যেখানে সকল আনন্দ স্কুলের বাইরে আর স্কুল শুদ্ধ নিরানন্দতার প্রতীক, সেখানে শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়লে, সেটাই হতো জগতের আশ্চর্যতম ঘটনা। বিদ্যালয় ও শিশুর শিক্ষাজীবন তাই অবশ্যই আনন্দময় হতে হবে।

দশে মিলে আনি সাংস্কৃতিক জোয়ার

এখন দেশের বেশ কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ-এর অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র চালায়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ৪ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র এবং 'আশা' আরো ৪ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র চালাচ্ছে। সব মিলে সারাদেশে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ২ লাখ শিশু এখন শিক্ষা সহায়তা পাচ্ছে। এ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরাল কিছু তো নয়ই, বরং তাকে আরো শক্তিশালী করার কর্মসূচি। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও অনেক প্রাথমিক স্কুল চালাচ্ছে। সরকারও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে কিছু উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল চালায়, যেমন 'আনন্দ স্কুল'। এনজিও-পরিচালিত স্কুলগুলোয় পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুদের আবৃত্তি, গান, নাচ, অঙ্কন ইত্যাদি কমবেশি চর্চা করানো হয় এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। যদি প্রত্যেকটি স্কুল বছরে একদিন এলাকায় এরকম একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাহলে সারাদেশে তা একটি সাংস্কৃতিক ঢেউ সৃষ্টি করবে। যদি সরকার স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপর প্রতি স্কুলে শিশুদের নিয়ে একদিন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাহলে তা তৈরি করবে একটি সাংস্কৃতিক জোয়ার।

ক্ষুদে মাথায় বইয়ের বোঝা, পরীক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণের অমানুষিক চাপ, অকৃতকার্য হওয়ার আতংক, সাথীদের সঙ্গে প্রতারণামূলক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ধরনের অসুস্থতা থেকে শিশুরা বছরে একদিন হলেও মুক্তি পাক। শিশুর নেতৃত্বে বড়রাও শিখুক। আসুন, বছরে অন্তত একদিন সবাই শিশু হয়ে যাই ও নিজেকে শুদ্ধ করি।

সিদীপ শিক্ষা-কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক চর্চার শুরুর কথা

মো: জাহিদুল ইসলাম

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)-এর মূল্য লক্ষ্য 'বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা'। প্রায় সাড়ে ষোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশের ৯০% লোক গ্রামে বাস করে এবং তাদের বেশির ভাগেরই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান। আর এসব লোকজন তাদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সিদীপ তাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সিদীপ দেশের ১৩টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় ৯০টি শাখার মাধ্যমে মোট ২,৮৩৫টি গ্রামে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দীর্ঘসময় যাবত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সিদীপ উপলব্ধি করেছে গ্রামীণ সমাজকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে নিরক্ষরতামুক্ত করাও একান্ত প্রয়োজন। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিগত দশকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ও শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে। কিন্তু এইসব নানা অর্জনের পরও আশঙ্কার বিষয় হলো যে, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়ের অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার আগেই ঝরে যায়। আবার যারা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠে তাদেরও অনেকে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এইভাবে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠার আগেই প্রায় ৫০% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে যায়। (GOB, ২০০৯) ফলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী জনগোষ্ঠীর

> প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বাবা-মা সন্তানদের লেখাপড়া শিখাতে যথেষ্ট আগ্রহী। তবে সমস্যা হচ্ছে বাচ্চারা বিদ্যালয়ের পড়া বাড়ি এসে প্রস্তুত করতে পারছে না। দরিদ্র শ্রেণীর এই বাবা-মা বা বাড়ির বড় কেউ ওদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছেন না। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাও নিরক্ষর।

অর্ধেকই যখন শিক্ষা গ্রহণের আওতায় থাকছে না, তখন নিরক্ষরতা এদেশের একটি বড় সমস্যা হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে। সিদীপ ঠিক এই সমস্যাটি নিয়ে কাজ করার প্রয়াস গ্রহণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বাবা-মা সন্তানদের লেখাপড়া শিখাতে যথেষ্ট আগ্রহী। তবে সমস্যা হচ্ছে বাচ্চারা বিদ্যালয়ের পড়া বাড়ি এসে প্রস্তুত করতে পারছে না। দরিদ্র শ্রেণীর এই বাবা-মা বা বাড়ির বড় কেউ ওদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছেন না। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাও নিরক্ষর। ফলে পরদিন বাচ্চারা পড়া না পারার কারণে শিক্ষক এবং সহপাঠীদের কাছে লজ্জা পায়। কাজেই একসময় স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ তারা হারিয়ে ফেলে। যার বাস্তব চিত্রটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ২০০৫ সালে সলিমগঞ্জে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে প্রত্যক্ষ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে সে বছর থেকেই সংস্থা 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' (শিসক) নামে নতুন কার্যক্রম শুরু করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো: দরিদ্র, নিরক্ষর এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ করা ও তাদের শিক্ষার ভিত মজবুত করে গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি 'সবার জন্য শিক্ষা'কে সহায়তা প্রদান।

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যার মধ্যে দারিদ্র্য, অভিভাবকদের নিরক্ষরতা ও অসচেতনতা, শিশুর অপুষ্টি, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব অন্যতম। সিদীপ এই কর্মসূচির মাধ্যমে অভিভাবকদের নিরক্ষরতার বিষয়টি নিয়েই কাজ করছে। সংস্থার শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রামের কোনো কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে বা শিক্ষিত গৃহবধূর মাধ্যমে গ্রামের ২০-২৫ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে একজনের বাড়ির উঠানে বা বারান্দায় প্রতিদিন বিকালে ২ ঘণ্টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া অনুশীলন করানো হয়। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শিক্ষিকা নির্বাচন, পড়ার জন্য বসার স্থান, মাসিক ফি, পড়ানোর সময়সূচি ইত্যাদি সকল বিষয় ঠিক করা হয়। ২০০৫ সালে ১০টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে এ কর্মসূচির যাত্রা শুরু। গ্রামবাসী এবং অভিভাবকদের ব্যাপক আগ্রহের কারণে বর্তমানে দেড় হাজার গ্রামে আড়াই হাজার শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ষাট হাজার শিক্ষার্থীকে এরূপ শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা 'আশা' এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ৪০টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিদীপ উদ্ভাবিত শিশু শিক্ষার মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে। সিদীপ ও অন্যান্য সংস্থা মিলে পরিচালিত এ কেন্দ্রের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষের উপর।

শিক্ষার্থীদের পরবর্তী দিনের স্কুলের পড়া প্রস্তুত করে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের বর্ণ, শব্দ, বাক্য, ছবি আঁকা, গণনা এবং নামতা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে শিক্ষিকাগণ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। এছাড়া শিশুদের মানসিকতা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। তাই শিশুদের মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় সপ্তাহে একদিন নানারকম সাংস্কৃতিক চর্চা করানো হয়। আবার বছর শেষে একদিন তাদেরকে নিয়ে একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যা অভিভাবক, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গ্রামবাসীরাও উপভোগ করেন।

সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন

মো: জাহিদুল ইসলাম, মো: আমিনুল ইসলাম, মো: আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ আলী, গাজী জাহিদ আহসান ও মো: ইকবাল হোসেন

সিদীপ বর্তমানে ১৪৬০টি গ্রামে ২৫২৫টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে। শিশুদের মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোয় সপ্তাহে একদিন নানারকম সাংস্কৃতিক চর্চা করানো হয়। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শিক্ষিকাগণ সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ব্রাশ করা, নিয়মিত নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা, খাবার আগে ও পায়খানা থেকে বের হয়ে ভালভাবে হাত ধোয়া, নিয়মিত গোসল করা, পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং অভিভাবক ও গ্রামের লোকজনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বিগত কয়েক বছর যাবত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' উদযাপন করছে। এ বছর নভেম্বর ২২-২৭ ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপনের উদ্দেশ্য: শিশুদের সারা বছরের লেখাপড়ার ক্লান্তি ও একঘেঁয়েমি দূর করা, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কে মানুষকে উৎসাহিত করা, শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা, শিশুর প্রতিভা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টি, পাঠ্যসূচি বহির্ভূত সামাজিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ আবহে বিনোদনের সুযোগ তৈরি, অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে নিজ সামর্থ্যের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণকে অধিকমাত্রায় সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপনকে পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা করার জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে ৭ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। তারা কুটি, সলিমগঞ্জ, বারইয়ারহাট, বজরা, ময়নামতি, তিতাস, সোনারগাঁ, টঙ্গীবাড়ী, লাকসাম, মাইজদী, লক্ষীপুর, হাজীগঞ্জ, মাওনা ও আশুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণত অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে। এরপর সকল শিক্ষার্থী সমবেত কণ্ঠে জাতীয়সঙ্গীত পরিবেশন করে। কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীরা মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার এবং বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার শপথ পাঠ করে।

এরপর শুরু হয় শিশুদের আবৃত্তি, গান, নাচ, নাটক, কৌতুক ইত্যাদির একক ও দলীয় উপস্থাপনা। শিক্ষার্থীরা সুন্দর পোষাকের সাথে সাজগোজ করে আসে। অনেক শিশু লাল, হলুদসহ বিভিন্ন রংয়ের শাড়ি পরে তার সাথে গাঁদা, গোলাপ ফুল দিয়ে সেজে আসে। এতে করে অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও গোছানো পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

কোন কোন এলাকায় অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অতিথি সবাই মিলে রাস্তা-ঘাট এবং স্কুল ও বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করেন। এক্ষেত্রে মুন্সিগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর শাখার উত্তর পাইকপাড়ার ২টি শিক্ষাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। অনুষ্ঠানটি হয় উত্তর পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়। শুরুতে উপস্থিত সকলে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ ও সামনের রাস্তার কিছু অংশ পরিষ্কার করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শ্যাম প্রসাদ দাস এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার রুহুল আমিন সহ বিভিন্ন ব্যক্তি। গাজীপুর বোর্ডবাজারে সিদীপ মডার্ন স্কুল ও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির ছাত্রছাত্রী মিলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি সিদীপ মডার্ন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু

হয়ে বটতলা বাজার পর্যন্ত ঘুরে আবার স্কুল প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। এতে কিছু ছাত্রছাত্রী হাতে ঝাড়ু ও ঝুড়ি নিয়ে র‍্যালির সামনের কিছু অংশের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে। কুমিল্লার কোতোয়ালীতে সংস্থার চাঁপাপুর শাখার সিদীপ মডার্ন স্কুল এবং শিসক শিক্ষার্থীরা মিলে হাউজিং এস্টেটের প্রায় আধা কিলোমিটার রাস্তা পরিষ্কার করে। সংস্থার সোনাপুর শাখার সাহাপুর শিক্ষাকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে স্থানীয় কমিশনারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান-স্থান ও এর আশপাশের কিছু জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। এছাড়া অনেক অনুষ্ঠানে কিভাবে হাত ধুতে হবে শিক্ষার্থীদের তা হাতেকলমে শিখিয়ে দেওয়া হয় ও শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

অনুষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্পৃক্ততা। প্রতিটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সকল অভিভাবক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। অতিথিগণ অনুষ্ঠান আয়োজনে বিভিন্নরকম সহযোগিতা ও আয়োজকদের অনুপ্রাণিত করেন। তাঁদের কেউ চেয়ার-টেবিলের, কেউবা মাইকের, আবার কেউ সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের জন্য যেমন পুরস্কার ছিল, আবার উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর জন্য ছিল সান্ত্বনা পুরস্কার। কলম, পেন্সিল, পেন্সিল বক্স, স্কেল, রাবার, মগ, টিফিন বক্স, বিভিন্ন সাইজের বাটি, মেলামাইনের প্লেট, জগ, সাবান, চকলেট ও বিস্কুট এসব ছিল পুরস্কারের উপকরণ। সিদীপের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ উদ্যোগেও বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ সিদীপ-এর শিক্ষা কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তাঁরা মনে করেন এরূপ শিক্ষাকেন্দ্র যত বৃদ্ধি করা যাবে সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম ততই বেগবান হবে। কারণ আমাদের গ্রামের খেটে খাওয়া বাবা-মা অনেকেই নিরক্ষর। সেক্ষেত্রে সিদীপ স্কুলের শিক্ষিকারা এসব বাচ্চাদের পড়া শিখিয়ে দিয়ে তাদের মায়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া এসকল শিক্ষার্থীর সাবলীল পরিবেশনাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। ক্ষুদে শিক্ষার্থীগণ বিরাট সংখ্যক দর্শনার্থীর সামনে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ছড়া-কবিতা, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি উপস্থাপন করে সকলকে বিমোহিত করেছে। শিশুদের মানসিকতা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ হবে। অন্যদিকে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের উপর অপসংস্কৃতি ও অপচর্চার প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে। সিদীপের এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সুন্দর ও ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিতে এবং একটি ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

প্রতিবেদকগণ সকলেই সিদীপ-এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত

সিদীপে শিক্ষা

মোঃ আবুল বাশার তালুকদার
(ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কুটি শাখায় কর্মরত অবস্থায় লেখা)

সিদীপ আমার দিগন্তে
আগামীর চির আহ্বান,
সিদীপে আমার প্রথম শিক্ষা
প্রথম আলোর দান,
সিদীপে কত শিশু
শিক্ষা নিয়ে হয় বলীয়ান।
সিদীপ থেকে পায় যে তারা
বর্ণ শেখার জ্ঞান,
সিদীপ আমায় এনে দিল
সুশিক্ষার প্রতিদান।
ঝরে পড়া গরিব মায়ের প্রাণ
কোলে নিলেন মায়ের সুসন্তান
পল্লীর মেয়ে সব শিক্ষিকা মহান।

বিজয় দিবস উদযাপন

লাকসামে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মোঃ শরিফুল হক

বাঙালির পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির দিন ১৬ ডিসেম্বর – মহান বিজয় দিবস। শৌর্য আর বীরত্বের এক অবিস্মরণীয় দিন এটি। এই দিনটি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৭১ সালের সেই দিনকে যেদিন সবহারানো বাঙালির প্রাণে ছড়িয়ে পড়েছিল স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ, বিজয়ের উল্লাস। দিনটিকে স্মরণ করে এবছর ১৬ ডিসেম্বর কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় সিদীপ মডার্ন স্কুল ও সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নশরতপুর গ্রাম পুরোটায় যেন সাজসাজ রব পড়েছিল। ভোরের লাল সূর্যটা তখনো পূব আকাশে উঁকি দেয়নি। কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারদিক। সকালের মুক্ত বাতাসে সজীব চারপাশ। লাল-সবুজসহ নানা রঙে রাঙিয়ে এসেছেন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। সবার মনে আনন্দের হিল্লোল।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন লাকসামে সিদীপের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মো: রশিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন খোরশেদ আলম। বেলা যত বাড়তে থাকে মানুষের সমাগম তত বাড়তে থাকে। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয়, ছিল আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যকে মনে করে নানা দেশীয় খেলা, যা বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই দেখেনি বা জানে না। শিশুদের খেলা দিয়ে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনের কার্যক্রম। আর্কষণীয় খেলা ছিল দড়ি লাফ, মোরগ-লড়াই, বিস্কুট-দৌড়, অংকের দৌড়, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি। সিদীপের ফিল্ড অফিসার ও এলাকার যুবকদের জন্য ছিল মোরগ-লড়াই ও গুপ্তধন আহরণ এবং সিদীপ কর্মী বনাম এলাকাবাসীর মধ্যে দড়ি টানাটানি। এলাকার মহিলাদের জন্য ছিল প্লেট দৌড়, বালিশ খেলা ও মুড়ি খাওয়া। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দায়ক খেলার নাম ছিল 'চাচা আপন জান বাঁচা' যা মূলত বৃদ্ধদের জন্য। এতে প্রত্যেকের কাছে একটি করে হাঁড়ি ছিল যেটাকে যেভাবেই হোক ভাঙার হাত থেকে বাঁচাতে হবে, আর অন্যরা একজন আরেকজনেরটা ভাঙার চেষ্টা করবে। উক্ত খেলাটি বৃদ্ধরা খেলে যেমন আনন্দ পেয়েছেন, তেমনিভাবে উপস্থিত সকল দর্শক তা উপভোগ করেন। শাখা ব্যবস্থাপক ও সমপযার্য়ের অন্যান্য কর্মকতার জন্য ছিল বলনিক্ষেপ প্রতিযোগিতা। এ ছাড়াও সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল 'যেমন খুশি তেমন সাঁজো'। এ প্রতিযোগিতায় দেখা যায় অতিথি পাখি, গাঁয়ের বধূ, মালী, মুক্তিযোদ্ধা, জুমচাষী, মুক্তিযোদ্ধার মা ইত্যাদি।

পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোহাম্মদউল্লাহ ও বিশেষ অতিথি জনাব মো: আব্দুল কাদির। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছোটে-াছোটো ছেলেমেয়ের মনোমুগ্ধকর এ অনুষ্ঠান দেখে এক মুহূর্তের জন্য কেউ নড়ছিল না। নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতিতে ভরপুর এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল জাদু ও স্থানীয় ফ্রেন্ডস মিডিয়া ড্যান্স একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন লাকসামের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, লাকসামের শাখা ব্যবস্থাপক, চাঁপাপুরের শাখা ব্যবস্থাপক, কুমিল্লার মনিটরিং অফিসার, লাকসাম শাখার কর্মীবৃন্দ, লাকসাম অঞ্চলের অন্যান্য শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও কর্মীসহ এলাকার যুবক সমাজ। এরূপ অনুষ্ঠান আরো আয়োজন করা দরকার যাতে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়, বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হয় এবং বাঙালী সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকসমূহ সর্বত্র ছড়িয়ে যায়।

গণমাধ্যমে সিদীপ-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন

এবছর সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্র সমুহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন সংক্রান্ত সংবাদ বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এসবে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাসহায়তায় সিদীপের উদ্যোগ এবং শিশুদের নিয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গ্রামের মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা উঠে আসে।

দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ
THE DAILY CHANDPUR KANTHA

www.dakprotidin.com
ডাক প্রতিদিন
ফরিদগঞ্জে অসহায় পরিবারের শিশুদে
ব্যতিক্রমী নাচ-গানের অনুষ্ঠান
ফরিদগঞ্জে এনজিও সংস্থা সিদীপের আয়োজনে শিশু শিক্ষার্থীদের নাচ-গানের খন্ডচিত্র।

দৈনিক সচিত্র নোয়াখালী
THE DAILY SACHITRA NOAKHALI
জমিদারহাটে সাংস্কৃতিক ও পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ ২০১৪

স্টাফ রিপোর্টার ❑ 'কোন গায়ে কোন ঘর, কেউ রবেনা নিরক্ষর' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক ও পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ ২০১৪, সিদীপ শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচী (লিসক) বেগমগঞ্জ উপজেলা জমিদারহাট অফিসের আওয়াতাধীন লাউতলী মধ্যপাড়া গ্রামে সিদীপের ৭টি স্কুলের মোট ১৭৫জন ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ নিয়ে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মো. আমিনুল ইসলাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম এবং সিদীপ জমিদারহাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. আবদুল সুলতান, লাউতলী গ্রহমর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আবুল কাসেমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে মধ্য ছিল কোরআন তেলওয়াত, শেষে কবিতা, ছড়া, কৌতুক, গান ও নাচের শেষে ম্যাজিক বল খেলা, বিস্কুট দৌড় ও মুরগীর লড়াই। পুরস্কার বিতরণের

দৈনিক মুন্সীগঞ্জের কাগজ
সংবাদ প্রকাশে সকল ভয়-ভীতির উর্ধ্বে
মুন্সীগঞ্জ জেলার সরকারী মিডিয়া তালিকাভুক্ত একমাত্র দৈনিক

টঙ্গীবাড়িতে শিক্ষা সাংস্কৃতিক সমাপনি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বৃহস্পতিবার বিকালে মুন্সীগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ির উপজেলার আব্দুল-হপুর ইউনিয়নে সিদীপ কর্তক আয়োজিত ঝরে পড়া শিশুদের স্কুল গামী করার লক্ষে শিক্ষা সাংস্কৃতিক সমাপনি অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয় । এসময় উত্তর পাইকপাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ প্রধান শিক্ষক শ্যাম প্রসাদ দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিদীপ এর সিঃ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হারুন আল রশিদ ,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তি যোদ্ধা খন্দকার রুহুল আমিন ,টংগীবাড়ি উপজেলার নিচসার সভাপতি এম,জামাল হোসেন মন্ডল, মিজানুর রহমান প্রমুখ। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সিদীপ এর আব্দুল-পুর শাখার ব্যবস্থাপক বিকাশ চন্দ্র দাস । অনুষ্ঠানে পাইক পাড়া সিদীপ স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহন করেন।

কুমিল্লার সেরা ও জনপ্রিয় দৈনিক
কুমিল্লার কাগজ
www.comillarkagoj.com
সিদীপের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অতলে ডুবুক

বিনোদিনী দাসী

এস এস তমোরাশি গ্রাস চরাচর
নিবিড় মেঘের কোলে, দামিনী বেড়াক খেলে,
কোটি কোটি বজ্র হান ধরণীর প'র।
চুরমার হয়ে যাক বিশ্ব ধরাধর ॥
প্রলয় জলধি জল উঠুক উথলে
নিবায়ে প্রাণের গান, শূন্য করি হৃদিখান,
ঘুমাক প্রকৃতি-সতী আঁধারের কোলে।
ডুবে যাক রবি-শশী ঘূর্ণমান জলে ॥
সাঙ্গ করি প্রেমখেলা দিগঙ্গনাগণ
ঝাঁপ দিক কুতূহলে, মহার্ণব মহাজলে,
ডুবুক মিলন গান সাধের স্বপন।
চিরদিন তরে সব হোক নিমগন ॥
উড়ুক উড়ুক বিশ্ব যে যেমন পারে
তথাপি রহিবে ভুল, দিতে তার সমতুল,
অভাগ্য হৃদয় চূর্ণ কত বজ্রাধারে।
উৎপত্তিবা লয় তার তুলনার হারে ॥

নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী দাসী (১৮৬২-১৯৪১) বাংলার মঞ্চে একজন কিংবদন্তী অভিনেত্রী। জন্মগ্রহণ করেছিলেন সমাজের নিম্নস্তরে। ১২ বছর বয়সে তিনি অভিনয় জগতে প্রবেশ করে (১৮৭৪-১৮৮৬) মাত্র ১১ বছর নাট্যাভিনয়ে যুক্ত থেকে এই অল্প সময়ে বহু মানুষের স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছেন। তিনি কাজ করেছেন বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়গুলোতে শ্রেষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়েও বহু যাত্রাপালা ও নাটক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে 'ঢাকা থিয়েটার'-এর 'বিনোদিনী' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' ও 'আমার অভিনেত্রী জীবন' এবং কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' ও 'কনক ও নলিনী'।

বিবেক

সংহিতা বহ্নি

সত্যিই কি মানুষের বিবেক লোপ পাচ্ছে?
বিবেকের তাড়নায় কি এখন
মানুষ আর ভোগে না?
নাকি সময়ের সাথেসাথে 'বিবেক' নামক শব্দটি
মানুষের চিত্তমন্দির থেকে চিরতরে মুছে গেছে।
নাকি আমরা পণ্যের মতো
বিবেককে আজ বিক্রি করে দিয়েছি!
বিবেকের দংশন বলতে
এখন আর নেই কিছু
কারণ বিবেককেতো আমরাই ধ্বংস করে দিয়েছি
কিছু নোংরা কাজ আর কিছু নোংরা সময়ের কাছে।

নাফিয়া সাদাত (জাহিন), ৫ম শ্রেণি
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

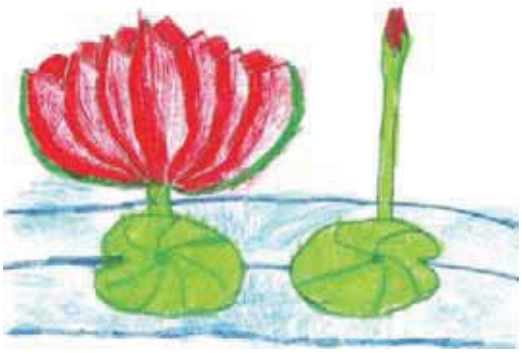

প্রাচুর্য রায়, ১ম শ্রেণি
সরকারি ল্যাবরেটরি উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

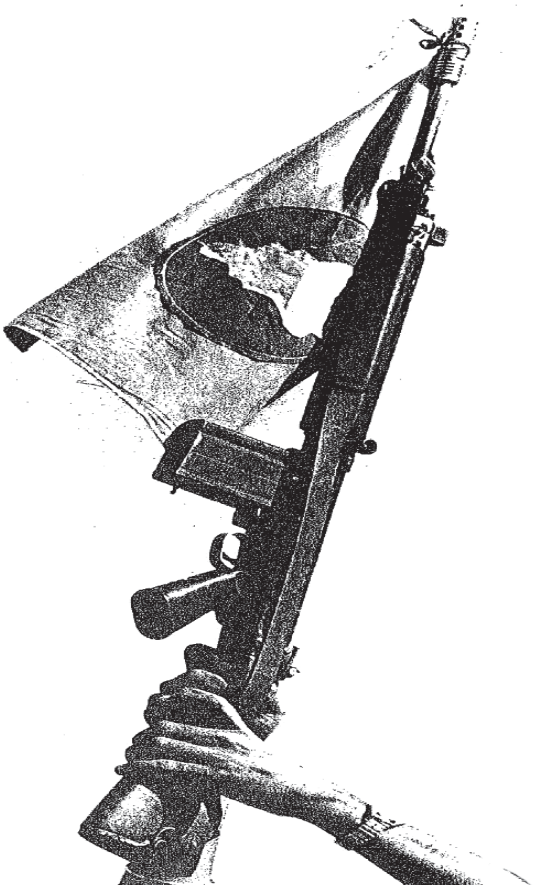

ছাতিম গাছ

এনামুল হক টগর

মধ্যরাতে কবি একা হেঁটে যাচ্ছে। হইজনের বাঁশ বাগানের মাঝদিয়ে। বাঁশ বাগানের ছোট নালার উপরে একটি ছাতিম গাছ। বহুদিন ধরে এই ছাতিম গাছের পাশে মানুষের মাথার একটি খুলি পড়ে ছিল। মাথায় কপালের উপর আঁকাবাঁকা বিভিন্ন ধরনের লেখা ছিল।

কবি মাথা দেখে ভাবলো মানুষটি খুব পাপী ছিল। কারণ ছোট বেলায় গুরুজনেরা বলতেন পাপীর মাথায় কপালে তার পাপের কথা লেখা থাকে। রাতের নিঝুম হালকা বাতাসে বাঁশ বাগানের ভেতর থেকে শনশন শব্দ শুনা যাচ্ছিল।

কবি থমকে দাঁড়ায়। সাদা শাড়ি পরা এক রূপসী মেয়ে আস্তে আস্তে কবির দিকে হেঁটে আসছে, তারপর ধীরে ধীরে কবির পাশে এসে দাঁড়ালো সে। মেয়েটি কবিকে বললো, ভয় পেয়োনা, তুমি তো কবি, তোমার জীবনের সামনেই তো সব ঘটনা এসে দাঁড়াবে।

আমার নাম সুলতানা। বহুকাল পূর্ব থেকে আমি এখানে বাস করি। এই ছাতিম গাছই আমাকে ছায়া দেয়। ছাতিম গাছটি হয়তো বেশিদিন বাঁচবে না, তাই আমাকেও হয়তো কিছু দিনের মধ্যে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

জানো কবি, আজ রাতে তেমন ঘুম হচ্ছে না, শুধু এপাশ-ওপাশ করতে এতোটা রাত কেটে গেলো।

আশপাশের বাড়িগুলোয় ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, অসুস্থ মানুষের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ইছামতি নদীর তীরে মনে হচ্ছে, এই বুঝি আলো জ্বলে উঠলো আবার এই বুঝি আলো নিভে গেলো।

মেয়েটি বললো, গভীর রাত্রিতে এই জীবনের রূপ দেখে আমার মৃত্যুর কথা মনে হলো। জীবন আসে, ঘুরে বেড়ায়, রূপ বদলায় আবার চলে যায় – এ এক বিস্ময়, অচিন ঈশ্বরের খেলা। মনে হয় সমগ্র বিশ্ব জগত সৃষ্টি কর্তার কিন্তু সৃষ্টি কর্তা বিশ্বজগতের নয়।

চিন্তা করছিলাম আমার জীবনের কথাগুলো মানুষের জানা দরকার। তাই তোমাকে দেখে ছুটে এলাম। জানো কবি, এই মাথার খুলিটি কার? যে খুলিটি বহুদিন ধরে এই ছাতিম গাছের নীচে পড়ে আছে। সে এক মর্মান্তিক ঘটনা।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন সপ্তম শ্রেণিতে লেখাপড়া করতাম। মা-বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতো।

ভেবেছিলাম লেখা পড়া শেষ করে বড় কোন চাকুরি করবো। আমার ছোট একটি ভাই ছিল, তাকে মানুষ করবো। সামর্থ্য হলে গরিব প্রতিবেশীদেরকে দেখবো। দিন যায় রাত যায় - আমি হাঁটতে থাকি আর ভাবতে থাকি জীবন নিয়ে। এরই মাঝে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একদিন আমি স্কুল থেকে আসার আগেই কারা যেন বাবামাকে ধরে নিয়ে গেছে। ছোট ভাইটির মৃতদেহ বাড়ির ভেতর পড়ে ছিল। আমি পাগলের মতো নিজ বাড়িতে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। বাবামাকে খুঁজতে লাগলাম। গ্রামে কোন লোকজন নেই।

কার কাছে সাহায্যে নিবো। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এই বাঁশ বাগানে ছাতিম তলায় এসে পৌঁছাই। হঠাৎ এই পথে কারা যেন পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, বলে শ্লোগান দিতে দিতে আমার দিকে আসলো এবং আমাকে বলল তুই এখনো বেঁচে আছিস? মরিসনি শালি! তোর বাবা-মা-ভাইকে খুন করেছি আর তুই এখনো বেঁচে আছিস! এই বলে ওরা আমার গলা টিপে ধরলো আর আমি তখন জ্ঞান হারালাম।

তারপর থেকে আমি এইভাবে বেঁচে আছি। কবি, তুমি এই পথ দিয়ে আসার কিছুক্ষণ পূর্বে আমিন প্রামানিক, আবু প্রামানিক, আলো রায়, আবু কামার সহ অনেকেই হেঁটে গেছে। ওরা সবাই অনেক বয়সি, তাই আমার কথাগুলো ওদেরকে বলিনি। আবুল কাশেম আর নুরুল ইসলাম সামাজিক বিষয় নিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে একজন পাল পাড়ার দিকে এবং একজন সিংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিকে চলে গেল। ওদেরকে কিছু বলিনি। তুমি তরুণ কবি, তাই তোমাকে সব ইতিহাস জানানো দরকার।

এরই মাঝে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। একদিন আমি স্কুল থেকে আসার আগেই কারা যেন বাবামাকে ধরে নিয়ে গেছে। ছোট ভাইটির মৃতদেহ বাড়ির ভেতর পড়ে ছিল। আমি পাগলের মতো নিজ বাড়িতে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। বাবামাকে খুঁজতে লাগলাম। গ্রামে কোন লোকজন নেই। কার কাছে সাহায্যে নিবো। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এই বাঁশ বাগানে ছাতিম তলায়

মাঝ রাত ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে নতুন সকালের দিকে। মহাবিশ্বের রূপ বিরাজ করছে এক অশেষ, অক্ষয় ও অফুরন্ত প্রেমের চিরন্তন পথে। সব কিছু মিলে এক। চিরন্তন চেতনার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কাজ অবিরাম ও অবিরত ভাবে চলছে। কবি দাঁড়িয়ে আছে অশরীরী আঁধারের বুকে। কিছুক্ষণ পরেই সুলতানা আঁধারের সাথে মিশে যাবে।

জীবনের ব্যর্থতা বুকে নিয়ে সুলতানা কবিকে বলে, এই কষ্টের জীবন-ইতিহাস তুমি জাতিকে জানিয়ে দিও। প্রিয়তম স্বদেশের বুকে যেন আমাদের নাম লেখা হয়। বালুচরের প্রিয় নদটি আমাকে এখনো ডাকে, আমার স্বপ্নেরা এখনো কথা বলে। নিদ্রাহীন চোখের তারায় এখনো কষ্টরা ঘুরে বেড়ায়। ব্যথিত জীবনের ব্যর্থতা বুকে নিয়ে আমার কথাগুলো তোমাকে বলছি।

কবি বলে, ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে তুমি বেঁচে থাকবে এই তোমার প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। বনভূমি ও ফসলের মাঠ তোমার মমতায় চেয়ে থাকবে। শ্যামল এক কিষাণ তোমার অপেক্ষায় মাটিতে আবাদের বীজ ছড়াবে। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের মাঝে তোমার প্রিয় মাটিতে।

কথাগুলো শুনে ভাবতে ভাবতে কবি নিজ বাড়ির পথে হেঁটে যায় এবং বাড়ি পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া শেষে কিছু লেখার কাজ করে ঘুমাতে যায়। গভীর ঘুমে কবি মগ্ন। শেষ রাতে কবি স্বপ্নের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে ছাতিম গাছের নীচে যায় এবং দেখতে পায় যে সুলতানা এক অপরূপ সাজে দাঁড়িয়ে আছে।

তার কষ্টের দেহ থেকে চন্দনের ঘ্রাণ ভেসে যাচ্ছে। সরল সুন্দর। তখন কবির স্বপ্নভরা দুটি চোখের তারায় ইতিহাস ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবি চেয়ে চেয়ে দেখছে সুলতানাকে। হঠাৎ কারা যেন সাদা কাপড়ে আকাশ থেকে নেমে এলো। মনে হচ্ছে একজন নারী, একজন পুরুষ সাথে একজন কিশোর। সুলতানা কবিকে দেখে হেসে ওঠে এবং বলে এরা আমার একাত্তুরে হারিয়ে যাওয়া বাবা, মা আর ছোট ভাই। আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কবি, তুমি যাবে আমাদের সাথে?

কবির খুব ইচ্ছে সুলতানার সাথে যাওয়ার। ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে কবি সুলতানার কাছাকাছি যেতে চায়। বনভূমি ফসলের মাঠ নদীর ঢেউ বসন্তের দক্ষিণ বাতাস কবিকে স্বাগত জানায়।

জীবনের স্বপ্নসুখে কবি যেন এক নতুন কিষাণ। মাটিতে ঘুরে ঘুরে কিষাণীকে খুঁজছে। তৃষ্ণার আঁধারে ক্ষত বিক্ষত মন হঠাৎ নড়ে ওঠে। কিশোরী সুলতানার সরল চোখ দূরে সরে যেতে থাকে। তখন কবির বুকের ভেতর হাহাকার জাগে।

ক্ষুধাকাতর স্বপ্নহারা মানুষের আহাজারিতে সে জেগে ওঠে এক জীর্ণ সকালে এবং হাঁটতে হাঁটতে ছাতিম গাছের নীচে যায়। চোখ মেলে দেখে, মাথার খুলিটি পড়ে আছে। কবি সযত্নে মাথার খুলিটি নিয়ে যায় নদীর তীরে এবং সেখানে ভালো করে ধুয়ে পবিত্র এই মাটির মমতায় মাথার খুলিটিকে মৃত্তিকার নীচে ধর্ম মোতাবেক ঘুমিয়ে দেয় ...।

শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর কৌশল আমার অভিজ্ঞতা

রেহানা আক্তার

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত। শিক্ষা দেওয়া একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রত্যেক শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, শিশুদের মন নরম কাদামাটির মতো। তাই শিশুদেরকে আদর-স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর কৌশল জানা থাকতে হবে।

বাস্তবে সব শিশু একইরকমে শেখে না। একেক শিশু একেক-ভাবে শেখে। তবে শিক্ষকগণ যত বেশি শিশুকেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ ততবেশি কার্যকর হবে। এছাড়াও শিক্ষককে নিচের দিকগুলো মনে রাখতে হবে।

কুশল বিনিময়: শিক্ষক প্রথমে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের সালাম গ্রহণ শেষে তারা কেমন আছে জানতে চাইবেন। প্রয়োজনে দুয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকটে যেয়ে মিষ্টি ভাষায় কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নাম জানবেন আর কেমন আছে জানবেন।

নিরাপত্তামূলক পরিবেশ: শিক্ষক কোনো অবস্থাতেই কোনো ছাত্রছাত্রীকে ধমক দিবেন না। ক্লাসে কখনো বেত ব্যবহার করা যাবে না।

শ্রেণিবিন্যাস: ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত এলোমেলোভাবে বসে থাকতে পারে। শিক্ষক ঐ সকল ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণিভিত্তিক বসিয়ে দিবেন।

আবেগ সৃষ্টি: শিক্ষক অল্প সময় ব্যয় করে নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি যে কোনো একটি বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাসে ১০০ ভাগ মনোযোগী করে নিবেন। এতে শিশু ভালভাবে পড়া শিখতে পারবে।

চার্ট ও মডেল: শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর জন্য চার্ট ও মডেল ব্যবহার করতে হবে।

শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য সবরকম যত্ন: শিশুদেরকে বাগানের চারা ও ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একজন শিক্ষককে শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম যত্ন নিতে হয়। শিশু খেলাধুলা ও কাজ করার মাধ্যমে শেখে। স্কুলের পরিবেশ এমন হবে যাতে শিশু আত্মপ্রকাশে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়।

শিশুতোষ উপকরণ: শিশুর জন্য চাই শিশুতোষ উপকরণ। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুতোষ উপকরণ প্রণয়ন করা হয়। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে পাঠ্যবই, সহপাঠ বই, বিভিন্ন শিক্ষামূলক খেলনা ইত্যাদি। শিশুতোষ উপকরণ হতে হয় শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, মজাদার ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী। শিশুতোষ বই বড় হরফে যথেষ্ট ছবি ও অলঙ্করণসহ মুদ্রিত হতে হয়। বই রঙিন হলে শিশুরা বেশি আকৃষ্ট হয়। আর খেলনা জাতীয় উপকরণ হতে হয় সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং শিশুর মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম। এসব উপকরণ শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে বিধায় স্মৃতিশক্তিরও উন্নয়ন ঘটায়।

শিশুতোষ উপকরণ হতে হয় শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, মজাদার ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী। শিশুতোষ বই বড় হরফে যথেষ্ট ছবি ও অলঙ্করণসহ মুদ্রিত হতে হয়। বই রঙিন হলে শিশুরা বেশি আকৃষ্ট হয়। আর খেলনা জাতীয় উপকরণ হতে হয় সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং শিশুর মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম। এসব উপকরণ শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং মনোযোগ আকর্ষণ করে বিধায় স্মৃতিশক্তিরও উন্নয়ন ঘটায়।

শিশুতোষ বইয়ের ক্ষেত্রে বিগ বুক ভাল। এটি খুব সহজ ভাষায় লেখা, মজাদার ও রঙিন ছবিসহ চিত্রায়িত এবং আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত। এধরনের বই সাধারণ বই থেকে আয়তনে বড়। বিগ বুকে ব্যবহৃত শব্দের আকৃতি এবং ছবিও বড়-বড় হয়ে থাকে। কখনো কখনো গল্পের সঙ্গে বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল রেখে কোন প্রাণী বা জিনিসের অবয়বে বিগ বুক তৈরি হয়। এতে করে শিশুরা বইটি ধরে, নেড়েচেড়ে ও দেখে আনন্দ পায়। একজন শিক্ষক প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের ওঠানামার মাধ্যমে শিশুদের বিগ বুক থেকে পড়ে শোনান। পুরো বইটি কোন বোর্ডে আটকে শিশুদের আগ্রহী চোখের সামনে মেলে ধরেন। তাতে শিশুরা বেশ মজা পায়। পড়ার সময় শিক্ষকের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। পাঠ চলাকালে শিশুদের পাঠের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। ফলে তা শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে ও দক্ষতা লাভে সহায়ক হয়।

সিলেবাসের বাধ্যবাধকতা দিয়ে নয়, আনন্দের সাথে শিক্ষা দান: শিশু-কিশোররা চিরসুন্দর, নিরলস ও গতিময়। বড়দের দায়িত্ব বিদ্যমান গতিময়তাকে কার্যকরভাবে সঠিক পথে প্রবাহিত হতে সহায়তা করা। এর কার্যকর পথ হচ্ছে শিশু কিশোরদের মনে আনন্দ দেয়া। এমন কিছু শিক্ষা উপকরণ তাদের হাতে দেয়া যেগুলো থেকে আনন্দ সহকারে শেখা যায়। শিশুকাল শেখার কাল। নতুন কিছু রপ্ত করতে সে মোটেও আলসেমি করে না। আসল কথা হলো, বিষয়টা ভালো লাগাতে হয়। শিশু-কিশোররা শেখে খেলার ছলে, সারাদিন চলাফেরার পরিবেশ থেকে ও বড়দের থেকে। সিলেবাসের সীমাবদ্ধতা থেকে শিশুরা মুক্ত।

অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শেখানো: শিক্ষক যদি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কথা বলে, শিশুরা আনন্দ পায় এবং পড়া সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

দলভিত্তিক শিক্ষা: শিশুদের মধ্যে দল গঠন করে শিক্ষা দিলে শিশুরা সহজে শেখে।

ভালো কাজের প্রশংসা: শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর একটি কৌশল হচ্ছে ভালো কাজের প্রশংসা করা। ভালো কাজের প্রশংসা করলে শিশু খুশি হয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখা করতে আগ্রহী হয়।

শিশুকে স্বাধীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত: শিশুকে ধরাবাঁধা নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে এরূপ আদেশ দেওয়া যাবে না। এরূপ নিয়ম-কানুন শিশুদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। তাদেরকে স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।

শিশুদের বর্ণ চেনানোর কৌশল: বর্ণ চেনানোর জন্য শিক্ষক পুরাতন ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে অপর পাতায় সাইন পেন দিয়ে বর্ণগুলো লিখে নিয়ে আসবেন। এটি বোর্ডের উপর আটকে নির্দেশিকা কাঠি দিয়ে ধরে ধরে পড়ালে শিশুকে ভালোভাবে শিখানো যায়।

শিশুদের বর্ণ লেখা শেখানোর কৌশল: শিক্ষক আজকের পাঠের বর্ণটি বোর্ডের মাঝখানে লিখবেন এবং ধীরে ধীরে বর্ণটি বলবেন। তারপর শিক্ষক বোর্ডের বাম পাশে ও ডানপাশে তা লিখে দিবেন। খেয়াল রাখতে হবে ছোট শিশু যাতে এর নাগাল পায়। দুজন শিক্ষার্থী একেক করে বোর্ডে এসে বর্ণটির উপর হাত ঘুরাবে ও পাশে লিখবে। বোর্ডে হাত ঘুরানো শেষ হলে যার যার খাতায় অনুশীলন করবে। এভাবে শিশুদেরকে বর্ণ লেখা শেখানো যায়।

কবিতা-ছড়া পড়ানোর কৌশল: শিক্ষক প্রথমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখে উচ্চারণ ও বানানসহ বলবেন। তিনি সম্পূর্ণ কবিতা বা ছড়া ছন্দের তাল ঠিক রেখে কয়েকবার পড়ে শুনাবেন। এরপর শিক্ষার্থীরাও সাথে সাথে পড়বে।

তালি ও তুড়ির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া: কোনো শিশু পড়া পারলে অন্য শিশুদের দিয়ে তালি ও তুড়ি দিয়ে তাকে আনন্দ দিতে হবে। এতে শিশু খুশি হবে এবং অন্য শিশুরাও আনন্দের জন্য পড়া শিখে নিবে।

শব্দ তৈরির খেলা দিয়ে শেখানো: আমরা জানি শিশুরা খেলা পছন্দ করে। কোন শিশুকে যদি শব্দ তৈরির খেলা দিয়ে শেখানো যায় তাহলে সে সহজে শব্দ তৈরি করতে পারে।

শিক্ষকের প্রশিক্ষণ: শিক্ষক উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে শিশুদের ভালোভাবে পড়াতে পারেন। অতএব, এদেশের শিক্ষকদেরকে ভাল প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

শিশু শিক্ষা বড় শিক্ষা। উপরোক্ত কৌশলগুলোর মাধ্যমে এ শিক্ষা দিতে হবে। গাছকে যেমন রোপণ ও বড় করতে হয় পরিচর্যার মাধ্যমে, তেমিন শিশুকে গড়ে তুলতে হয় সুশিক্ষার মাধ্যমে।

লেখক হাজীঞ্জের উয়ারুক শাখায় একটি সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি রচনা-প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিজয়ীদের একজন।

শিক্ষালোক

শিক্ষালোক সমাজে শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাভাবনার প্রসার, শিক্ষানুরাগী মানুষের মাঝে ভাববিনিময় ও নতুন চিন্তা উসকে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। শিক্ষা নিয়ে আপনার ভাবনা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। পুরনো স্কুল/কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক/শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোন ব্যতিক্রমী শিক্ষা-উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল পাঠদান কৌশল সহ শিক্ষা বিষয়ে আপনার মূল্যবান ভাবনা-চিন্তা লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন
বই-পাগল এম. এল. নজরুল ইসলাম

আলাউল হোসেন

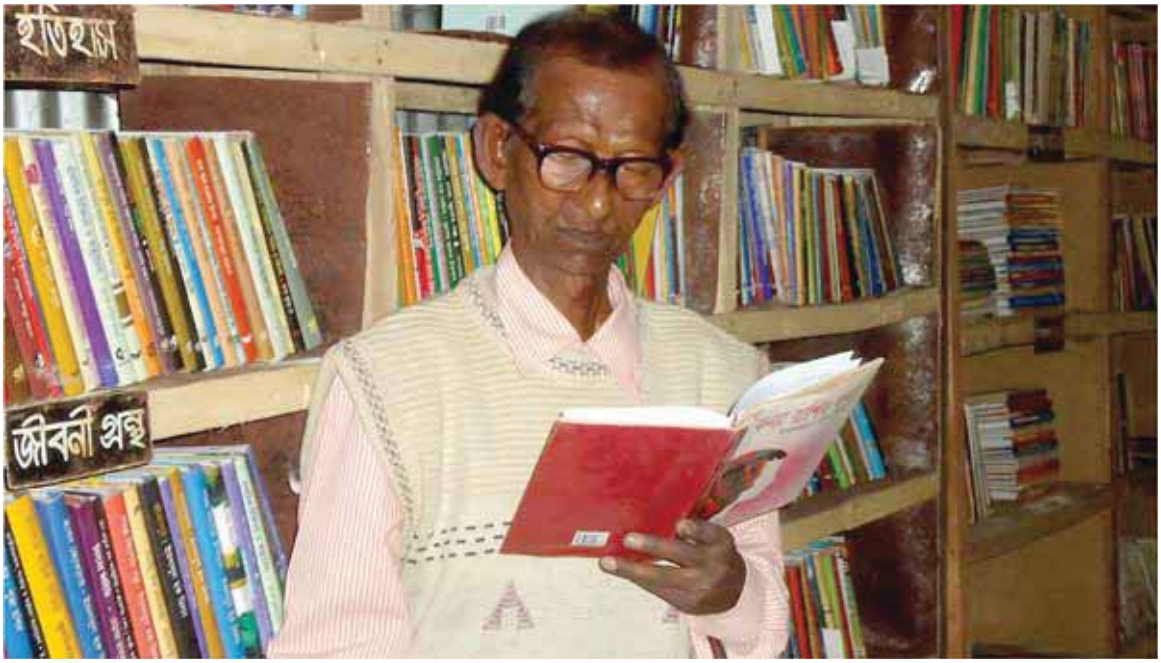

বয়স ৬৫। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। হালকা গড়নের শরীরটি যে দুর্বল তা দেখেই বোঝা যায়, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও বয়স তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে দমন করতে পারেনি। এখনও তিনি তার প্রতিষ্ঠিত উত্তরণ লাইব্রেরীতে রাত্রি যাপন করে মূল্যবান বইগুলো পাহারা দিয়ে থাকেন। আর এ কাজটি তিনি করে চলেছেন আজ প্রায় ৫০ বছর।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার হরিদেবপুর গ্রামের এই বই-পাগল মানুষটির নাম এম. এল. নজরুল ইসলাম। শৈশব থেকেই বই পড়ার পোকা ছিলেন তিনি। তৎকালীন রাজশাহী জেলা বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পার্বতীপুর আড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁর বাবা মৃত হামিজ উদ্দিন মিঞা রেলওয়ে বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। বাবার বদলিজনিত কারণে পরবর্তীতে ফরিদপুর চলে যান ও বসন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে লেখাপড়া করেন। এরপর রাজশাহী লোকনাথ হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। আবারও বাবার বদলিজনিত কারণে ঈশ্বরদী সাড়া মারোয়ারী হাইস্কুলে ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬২ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকার সরকারি বাংলা কলেজে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী দীন মোহাম্মদ, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, লেখক শাহেদ আলী, প্রফেসর আশরাফ ফারুকীসহ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ অবৈতনিক নৈশকালীন ক্লাস নিতেন বাংলা কলেজে। এম. এল. নজরুল ইসলামের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের সাহচর্যে যাওয়ার ও স্নেহভাজন হওয়ার। ফলে লাইব্রেরী গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহ জন্মে তখন থেকেই। বাংলা কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন এম.এল. নজরুল ইসলাম। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার নেশায় পড়ে তার লেখাপড়ায় ভাটা পরে। অনার্স ২য় বর্ষে অধ্যয়নকালীন ঢাকার 'মুডী ফিল্মস কর্পোরেশন' নামে একটি বেসরকারি সংস্থায় তিনি চাকরি নেন এবং সেখানেই শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এত সিনেমা হল ছিল না। কাজেই 'মুডী ফিল্মস কর্পোরেশন' নিজস্ব প্রজেক্টর মেশিনে দেশব্যাপী শহর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে পাকিস্তানি ও ভারতীয় ছবিগুলো প্রদর্শন করতো। চাকরির শুরুতেই এম. এল. নজরুল ইসলামকে 'পাবনা ডিস্ট্রিক্ট অর্গানাইজার' হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। দীর্ঘ ৩ বছর পর অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে 'মুডী ফিল্মস কর্পোরেশন'-এর বিলুপ্তি ঘটলে এম. এল. নজরুল ইসলামও চাকরি হারান। পরে তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার

উপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন এবং কয়েক মাস পর ঈশ্বরদীতে গড়ে তোলেন নিজস্ব উদ্যোগে 'কসমিক সাধারণ পাঠাগার'। এর মাধ্যমে শত শত যুবককে বইমুখি করতে সক্ষম হন। তার কয়েক মাস পর পাঠাগার পরিচালনার পাশাপাশি তিনি ঈশ্বরদীতে গড়ে তোলেন কসমিক শিল্পী গোষ্ঠী। তৎকালীন সিনেমা বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সিনেমা' ও 'চিত্রালী'তে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাল শিল্পীদের নিয়ে তিনি এ শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ঈশ্বরদী ও পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কসমিক শিল্পী গোষ্ঠী বিভিন্ন নাটকসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবশেন করে দীর্ঘ ৩ বছর। সে সময় কসমিক শিল্পী গোষ্ঠীর কার্যক্রম দেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। ১৯৬৯ সালে আরও বৃহত্তর কিছু করার লক্ষ্যে এম. এল নজরুল ইসলাম সপরিবারে ঢাকায় চলে যান। তিনি ঢাকার মুগদাপাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে গড়ে তোলেন 'মৌচাক ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি'। বুকশেলফসহ বড় ধরনের ভ্যান গাড়িতে করে ঢাকার বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পাঠকদের পছন্দমত বই আদান-প্রদান করত এই মৌচাক ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি। এইভাবে ঢাকায় অনেক নতুন পাঠক সৃষ্টি করেছিল এই লাইব্রেরিটি।

পাঠাগার পরিচালনার পাশাপাশি খিলগাঁওয়ে আরেকটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এম. এল. নজরুল ইসলাম গড়ে তোলেন মৌচাক শিল্পী গোষ্ঠী। যে শিল্পী গোষ্ঠী সেগুনবাগিচা সংগীত বিদ্যালয়, রেলওয়ে মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট, বেইলী রোডের থিয়েটার পাড়াসহ বিভিন্ন প্রান্তে রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে নাটক, নৃত্যনাট্য, কবিগানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও তিনি ৩টি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার ও ৫টি সিনেমার সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সর্বশেষ ১৯৮৭ সালে পাবনার কাশীনাথপুরে তিনি নিজ এবং ৯ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে একটি ভাড়া ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তরণ লাইব্রেরী নামের একটি সাধারণ পাঠাগার। বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এলাকায় হাজার হাজার পাঠক সৃষ্টি করেছেন। অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেও গত ২৭ বছর ধরে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে পাঠাগার পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে পাঠাগারটি তার নিজস্ব জমিতে আধাপাকা ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে একসাথে ৫০ জন বসে বই ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা পড়তে পারেন। এম. এল. নজরুল ইসলাম স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে গভীরভাবে জড়িত। উত্তরণ লাইব্রেরীর ব্যানারে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দিবস পালন করে আসছেন। সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় জোয়ার সৃষ্টিতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। বহু ছড়া, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস লিখেছেন। প্রকাশিতও হয়েছে ৭টি গ্রন্থ। উত্তরণ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ৪৯ সংখ্যা পর্যন্ত।

প্রায় ৫০ বছর ধরে মানুষকে বই পড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

'সিনেমা' ও 'চিত্রালী'তে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভাল শিল্পীদের নিয়ে তিনি এ শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। ঈশ্বরদী ও পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কসমিক শিল্পী গোষ্ঠী বিভিন্ন নাটকসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবশেন করে দীর্ঘ ৩ বছর। সে সময় কসমিক শিল্পী গোষ্ঠীর কার্যক্রম দেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

নিজের সংসারের দিকে ঠিকমতো নজর না দিলেও বইয়ের দিকে তার নজর থাকে সবসময়ই। তার প্রতিষ্ঠিত উত্তরণ লাইব্রেরী সম্পর্কে আলাপকালে এ অঞ্চলের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জানান, তার এই উত্তরণ লাইব্রেরীর কারণেই তারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছেন। তারা জানান, ছোটবেলা থেকেই উত্তরণ লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও তাই ভালো ফলাফলের দেখা পাই। বিশিষ্ট কবি গোবিন্দলাল হালদার বলেন, তার লাইব্রেরীতে এসে কবিতা আর ছড়ার বই পড়তাম। একসময় পড়তে পড়তে লিখতে আগ্রহী হলাম। তরুণ গল্পকার রুহান রাতুলও তার গল্প লেখার পেছনে এই লাইব্রেরীকেই প্রধান শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আলাপকালে এম. এল. নজরুল ইসলাম বলেন, উত্তরণ লাইব্রেরীর স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমি চিন্তিত নই। কারণ, প্রতিষ্ঠার পর একক উদ্যোগে বেশ কিছুদিন পরিচালনার পর স্থানীয় হিংসা-বিদ্বেষ ও গ্রাম্যরাজনীতি আমাকে ঘিরে ধরলে গ্রন্থাগারটির স্বার্থেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রন্থপ্রেমিক, সংস্কৃতিমনা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় স্কুল-কলেজ ও কিন্ডারগার্টেনসমূহের প্রধানদের নিয়ে একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। তারাই পাঠাগারটি পরিচালনা করছেন। আমি আজীবন অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক মাত্র। আমার মৃত্যুর পর এই কার্যকরী পরিষদ ও বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ উপদেষ্টা পরিষদই জনকল্যাণকর এই গ্রন্থাগারটি রক্ষা করে যাবেন ও যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম বিনির্মাণে উত্তরণ লাইব্রেরী নামের এ সাধারণ পাঠাগারটি কাজ করে যাবে বলে আমি আশাবাদী।

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর এলাকায় লোকগান

মোঃ তারিকুল ইসলাম

গ্রামের নাম রামকৃষ্ণপুর ভাটিকান্দি। ১৯৯১ সালে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই গ্রামেই ১৯৬০ সনে আমার জন্ম। ১৯৭১ সাল বা এর সামান্য আগে থেকে সব স্মৃতিই আমার মনে আছে। আমার গ্রামের পাশে ছিল হিন্দু অধ্যুষিত চৌকিঘাটা গ্রাম। সেই গ্রামের বিলের পাড়ে কতগুলি বাড়ি আর বিলের শেষ প্রান্তে ছিল বিরাট জঙ্গল। তার ঠিক সাথেই পঞ্চবটি নামক একটা জায়গা ছিল। সেখানে একটা স্থান ছিল জয়নারাণের আখড়া। পাশে বিশাল বাঁশ ঝাড়। সবই এখন নদীগর্ভে। সেখানেই প্রতিবছর চৈত্রমাসের শুরু হতে ঝড়-তুফান আর বৃষ্টি-বাদল শুরুর আগ পর্যন্ত একটানা সকাল-সন্ধ্যা নানা ধরনের গান, নাচ, অভিনয় বিশেষ করে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পালা অনুষ্ঠিত হতো। সেই গানের কথা ও সুর মনের মধ্যে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতো। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন না খেয়ে বসে বসে তা শুনতো। সেসব গানের কিছু স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় গেঁথে আছে। তার কিছু এখানে বর্ণনা করছি।

হাবু গান: গায়ক ভানু বয়াতি। সে একজন সাধারণ শ্রমিক। তার গ্রামের নাম মীরাকান্দি। দেখতে লম্বাটে গড়নের একজন মানুষ। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। পাশের গ্রামে বাড়ি হলেও দিনের বেশিরভাগ সময় সে আমাদের গাঁয়ে থাকত এবং কাজ করত। বিশেষ করে জোৎস্না রাতে পাড়ার নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর-যু-বা-বৃদ্ধ সকলের একসাথে বিনোদনের উত্তম মাধ্যম হিসাবে এই গান করা হতো। গানের প্রথম এবং প্রধান কলি:

উক্কা ফুফু, নৈচা ফুফু, গেলরে ফুফু।

কৃষ্ণলীলা: শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার জীবন ও প্রেম কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটি পালা গান আছে। এসবের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ, মানভঞ্জন, নৌকা বিলাস, নিমাই-সন্ন্যাসী ইত্যাদি পালা আগের দিনে গাওয়া হতো। গানের সাথে অভিনয়ের সংমিশ্রণ ছিল। তবে গানের আধিক্য ছিল। কৃষ্ণলীলা গান সাধারণত চৈত্র মাসে দিনের বেলায় কৃষকদের অবসর সময়ে ছায়াযুক্ত স্থানে করা হতো। গানের কিছু কলি:

ঘরে বসে কৃষ্ণ নামটি মায়েরে শুনাইও
মায়েরে শুনাইও, মায়েরে শুনাইও।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, হরে রামও।

ভাসান যাত্রা: ভাসান গান সাধারণত রাতের বেলায় অনুষ্ঠিত হতো। অভিনয়ের সংমিশ্রণে এই গান শুরু এবং শেষ করা হতো। অনেক রাত পর্যন্ত এসব গান হতো। গানের কলি:

কালো যে, কালো যে,
তোমার চোখেরও মণি
উঠাইয়া ফেলিব তবু
হেরবো না আর কালো
কালো হেরে প্রাণও গেল
তবু হেরবো না আর কালো।
কালো যে তোমার মাথার বেণী
মুড়াইয়া রাখিব তবু
হেরবো না আর কালো।

আলোমতির গান: এই গানও রাতে হতো। গানের সাথে কিছু অভিনয় থাকতো। এর কয়েকটি কলি:

আমি আলো একা বাড়ি থাকি
আমার বাপ-মায়ে চাকরি গো করে মহারাজের বাড়ি
আমি আলো একা বাড়ি থাকি।

আধ্যাত্মিক প্রেমের গান: আধ্যাত্মিক প্রেম ধরনের একটি গানের কথা এরূপ:
জল খাইতে গিয়েছিলাম
দীন ভিখারির বাড়ি
কে যেন মোর জল এন দিলো
মানুষ কিংবা পরী রে,
মন পাগল তার লাইগা রে।

বিয়ে-মুসলমানি ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের গান: সাধারণত বিয়ে বা মুসলমানির অনুষ্ঠানে এ ধরনের গান গাওয়া হতো। চমৎকার কণ্ঠে এলাকার মেয়েরা গাইতেন:

পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে
ভুচড়া খেতার তলে লো
তোমরা শোর কইরো না।

আবার ছিল:
নাইয়া ধুইয়া উঠলো ও মোর বাঁশি
কেরা দিবো তেল ও মোর বাঁশি
বাড়ির পাশে আছে কুলুগো ছেলে
সেইতি দিবো তেল ও মোর বাঁশি।

এছাড়াও ছিল ঘেটু যাত্রা, কমলার বনবাস, পুঁথিপাঠ, কবিগান ইত্যাদি। মানুষ এসব গান শুনে একদিকে আনন্দ পেত, আবার শিক্ষণীয় শ্লোক, বাক্য, চরণ এসব জীবনের নানা প্রয়োজনে প্রয়োগ করতো। এখন আকাশ সংস্কৃতিতে ভরে গেছে মানুষের জীবন। মানুষ হয়ে যাচ্ছে নিস্প্রাণ, কঠিন, কঠোর, মায়ামমতাহীন। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থবিত্ত, প্রাচুর্য এবং বিলাসী জীবনের দিকে ঝুঁকছে। আমাদের সংস্কৃতির মুল্যবান সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলছি।

লেখক: ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম), সিদীপ।

রোকেয়ার স্বপ্ন : নারী-পুরুষ সাম্য

খোন্দকার মাহবুবা

অবশেষে কোন এক প্রভাবশালী লোকের থাবায় একটি মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। জায়গা হয় খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে। সেখানেই তার জীবন – 'আমার আল্লাহ-রাসুলের নাম' বলে সে ভিখিরির সারিতে নেমে যায়। আর তার পাশ দিয়ে কোন কোটিপতি মারসেডিজ বেনজ হাঁকিয়ে রাস্তায় মিলিয়ে যায়। শোষণ-বঞ্চনা আর অসাম্যের এই চিত্র আমাদের দেশের সাধারণ ব্যাপার। অথচ প্রশ্ন জাগে না, সভ্য দুনিয়ায় এমনটি কেন হয়। একদিকে কোটি কোটি টাকার মালিক, অন্যদিকে নিরন্ন মানুষের স্রোত। এর নাম সভ্যতা! এই সভ্যতার জাঁতাকলে আমাদের মা-বোন পিষ্ট। বৈষম্য আর পশ্চাৎপদতার আর এক নাম নারী সমাজ। যারা পুরুষ দ্বারা শোষিত-লাঞ্ছিত-নিগৃহীত।

সুদূর অতীতে এমনটি ছিল না। তখন ছিল নারীদের হাতে ক্ষমতা। পুরুষ জাতি ছিল তাদের অধীনে। এই মাতৃতান্ত্রিকতা পৃথিবীতে বহুকাল ছিল। ইতিহাসের এক পর্যায়ে পুরুষ জাতি স্ত্রীজাতির কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। শুরু হয় নারী জাতির উপর পুরুষের আধিপত্য ও নির্যাতন। তার জের এখন পর্যন্তও চলছে। নারী জাতির উপর পুরুষের আধিপত্যের সংস্কৃতিই গড়ে ওঠে সমাজে। মাছের মাথাটা চাই ছেলের পাতে, মেয়েরা খাবে ডাল-ভাত। এভাবে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সুবিধা বজায় রাখা হয়। মেয়েদের জন্য অনেক বিধিনিষেধ, অথচ ছেলেদের এর বালাই নেই। অনেকে ধর্মীয় বুলি আওড়িয়ে এইসব ঝোঁককে জায়েজ করেন। আইন ও সামাজিক বিধিও পুরুষদের পক্ষে যায়।

মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া নারীদের উপর এই অন্যায়-অত্যাচার রুখে দাঁড়ান। এর ফলে নারীদের উপর বিধি-নিষেধ কিছুটা কমে। কিন্তু তার স্বপ্ন আজো পূরণ হয়নি। অবশ্য নারীবাদী মতাদর্শ ইতোমধ্যে মাথা তুলেছে, কিন্তু বেগম রোকেয়ার তত্ত্ব এ থেকে ভিন্ন। নারীবাদীরা যেমন নারীদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করেন, পুরুষদের উপর নারী আধিপত্যের জয়গান করেন, বেগম রোকেয়া তেমনটি চাননি। তিনি চেয়েছেন নারীদের সমঅধিকার। সাম্য – পুরুষ ও নারী সমান অধিকার ভোগ করবেন। আইনের চোখে, ধর্মের চোখে, সমাজের অনুশাসনের চোখে নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে।

অথচ শক্তি, ক্ষমতা ও গুণের দিক থেকে নারী জাতি পুরুষের চেয়ে হীন নন, বরং বিচার করলে নারীদের গুণই বেশি হবে। অথচ তারা কেবল ভোগের বস্তু। এ সমাজে একটি পণ্যমাত্র। সমাজ-রাষ্ট্রের এই বিচার বদলাতে হবে। আমরা নারীবাদ চাই না, চাই নারী-পুরুষের সমান অধিকার। বলতে কি নারীজাতি পুরুষ ছাড়াও চলতে পারেন; সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের মাহাত্ম্যে এখন পুরুষের আর দরকার না হলেও চলতে পারে। সূক্ষ্ম এবং ভারী কাজে নারী জাতি পিছিয়ে নেই। ইলেকট্রনিক্সের কাজ নারীরা পুরুষের চেয়ে ভাল বুঝেন। সেনাবাহিনী, বিমান চালনা, প্রশাসনিক কাজে নারীজাতি দক্ষতা দেখাতে পারেন। অথচ আজো নানা উপায়ে তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়েছে।

জাতির উন্নতি করতে হলে এই বেঁধে রাখা শক্তিকে মুক্ত করতে হবে। সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভেঙ্গে দিয়ে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই নারী-পুরুষ উভয়ের বিকাশের পথ খুলে যাবে। নারীবাদ আমরা চাই না। চাই নারী-পুরুষের সমান অধিকার। তাহলেই কেবল দেশ-জাতি-সন্ততি-সমাজের মঙ্গল। ইতিহাসের রায় এটাই – রোকেয়ার স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

নতুন ধরনের দুটি বই

আবিদ আনোয়ার

আগামী প্রকাশনী থেকে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বেরিয়েছে নতুন ধরনের দুটি বই। লেখক আশরাফ আহমেদ একজন বিশ্বখ্যাত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী। সত্তর দশকের প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণরসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে যে অল্প ক'জন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী নিয়োগ পেয়েছেন এবং প্রাণরাসায়নিক গবেষণায় বৈশ্বিক অবদান রেখেছেন সৈয়দ আশরাফ আহমেদ সেই শীর্ষস্থানীয়দের একজন। কলমী-নামে তিনি 'সৈয়দ' শব্দটি ছেঁটে দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত বইটির নাম 'কলাচ্ছলে বলা' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'জলপরী ও প্রাণপ্রভা'।

লেখাগুলো বিচিত্র বিষয়কে ধারণ করলেও অধিকাংশ লেখায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় ঘুরেফিরে এসেছে। ব্যক্তিগত নিবন্ধ কিংবা গল্প বলার ছলে তিনি বিজ্ঞানের বহু দুরূহ বিষয়কেও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। লেখকের ভাষাভঙ্গি সাবলীল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম হাস্যরসের প্রয়োগ তাঁর কথনভঙ্গিকে করে তুলেছে পাঠকবান্ধব। দুই বই থেকে দুটি উদাহরণ:

'হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আপনি হাসপাতালে গেলেন। ডাক্তাররা নির্দয়ের মতো আপনার আজন্ম লালিত সুন্দর বুকটিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে কেটে, হার্টটি বের করে, তার গায়ে লেগে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে, সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে, টক-মিষ্টি মসলা (ওষুধ) মেখে, বুড়িয়ে-যাওয়া হার্টটিকে একটি ২০ বছরের যুবকের হার্টে পরিণত করে তা আবার আপনার বুকে রেখে দিয়েছেন। এতদিন পড়তি বয়সের দুর্বল হার্টের যে কারণে (হয়তো) আপনার ভালোবাসার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, এখন শক্ত যুবকের হার্ট বুকে নিয়ে প্রতিদিন নতুন উদ্যমে অনেক বেশি... ভালোবাসতে পারবেন' (হার্ট অ্যাটাকের উপকারিতা, কলাচ্ছলে বলা)।

'সমুদ্রে অনেক মাছ আছে যারা রাতে আহারের সন্ধানে বেরোলে তাদের ঠোঁট ও জিভের চারপাশ থেকে বিচ্ছুরিত আলো দিয়ে শিকার ধরে। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে আসলে সে আলো তার নিজস্ব নয়। একধরনের ব্যাক্টেরিয়া মাছের ঠোঁটের চারপাশে বাসা করে, ঠোঁটে ও জিভে লেগে-থাকা খাবার খেয়ে, বংশ বিস্তার করে, মাছকে কিছুটা আলো উপহার দেয়। মাছও তাই আর তার ঠোঁট ধুয়ে বা কুলি করে জিভ পরিষ্কার করার কোন চেষ্টা করে না' (প্রভামিষ ও প্রভামাছ, জলপরি ও প্রাণপ্রভা)।

আত্মকথা, পারিবারিক প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, অগ্রজদের স্মৃতিচারণ, পারস্য, ভারতীয় ও গ্রিসীয় পুরাণ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি যা কিছুকেই তিনি তাঁর লেখার বিষয় করেছেন তাতেই প্রাসঙ্গিক মনে হলে পরিবেশন করেছেন বৈজ্ঞানিক তথ্য, বিশেষ করে যেগুলো মানুষের স্বাস্থ্য, বংশবৃদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি ও জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় বইটির ফ্ল্যাপে লেখাগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'এর কোনোটি গল্পের আকারে বলা প্রবন্ধ, কোনোটি প্রবন্ধের আকারে বলা গল্প, আবার কোনোটি গল্পের কাঠামোয় লেখা বৈজ্ঞানিক তথ্য। অথচ প্রতিটিতেই রসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গভীর চিন্তার খোরাকও অতি প্রচ্ছন্ন। তাই পড়া শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে তার রেশ রয়ে যায়।' লেখাগুলো পড়ে আমার নিজের কাছেও এমনটিই মনে হয়েছে। এই দাবি যথার্থ বলেই মনে করি। একটুও বাড়িয়ে বলা হয়নি। আমাদের বিজ্ঞান-সাহিত্য মূলত দুই ধরনের: বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে কট্টর আলোচনা কিংবা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। আশরাফ আহমেদের লেখাগুলো এর কোনো শ্রেণিতেই পড়ে না। ফলে একে বলা যায় বিজ্ঞান-সাহিত্যে এক নতুন ধরনের প্রয়াস। আমি বই দুটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং এই প্রবীণ বিজ্ঞানীর কাছে এ ধরনের আরও বহু লেখা প্রত্যাশা করি।

আবিদ আনোয়ার : কবি

দৈনিক 'সমকাল'-এর 'কালের খেয়া' (১৪ নভেম্বর ২০১৪) সাময়িকী থেকে পুনর্মুদ্রিত
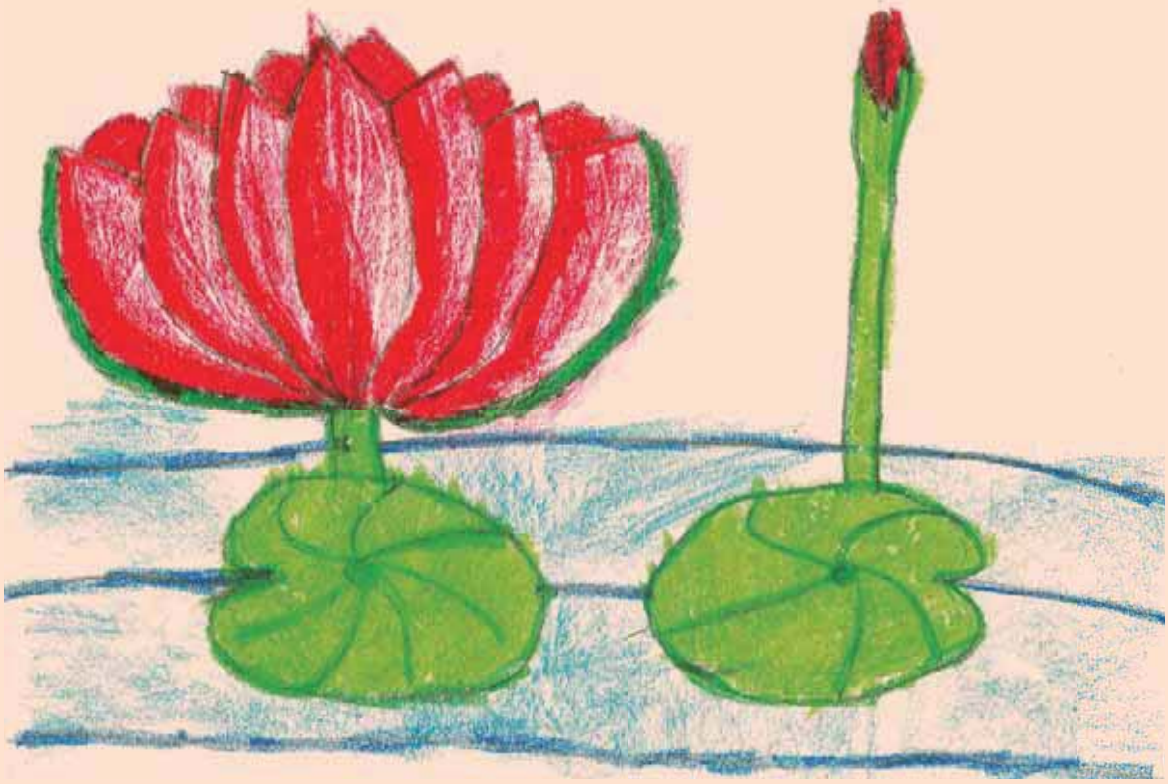
সব শিশু আলোকিত বিকশিত হোক